পঞ্চম অধ্যায়

লোকনাটক ও উত্তরবঙ্গের সমাজ জীবন

ভূমিকা ঃ

লোকনাটক লোক-সংস্কৃতির একটি অঙ্গ। গ্রামীণ লোক-সমাজের মানুষের মধ্য থেকে গ্রামীণ লোক-শিল্পীরা লোকনাটক রচনা করেন এবং অভিনয় করেন। এর মাধ্যমে গ্রামীণ লোক-সমাজ আনন্দ রসে সিক্ত হন এবং সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হন। লোকনাটকের মাধ্যমে লোক-সাংবাদিকতাও করা হয়ে থাকে।

ঐতিহাসিক নানা কারণে উত্তরবঙ্গ প্রাচীন জনপদরূপে চিহ্নিত হয়ে ছিল, কিন্তু গৌড় সাম্রাজ্যের পতন, ধ্বংসের পর এই অঞ্চল বৃহত্তর বঙ্গ ও ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। এছাড়াও গঙ্গা, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি বিশাল নদী এবং তাদের অসংখ্য উপনদী ও শাখানদী পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চল থেকে উত্তরবঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। "চারিদিকার পরিবেশ থেকে দীর্ঘকাল ধরে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবার ফলে তার মধ্যে আদিম ও গোষ্ঠীজীবনের ধারা বহুলাংশে নিরুপদ্রব রয়েছে। অবশ্য উত্তরবঙ্গের এই বিচ্ছিন্নতা চিরকাল ধরেই চলে আসছেনা। একদিন এই উত্তরবঙ্গেই বাংলার রাজধানী ছিল। উত্তরবঙ্গই দক্ষিণ ও পূর্ববাংলার দ্বারপথ ছিল। গৌড় ধ্বংস হয়ে যাবার পর থেকেই উত্তরবঙ্গের এই বিচ্ছিন্নতার অভিশাপের সূচনা হয়েছিল। নতুবা সেখানেই বহু সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন হয়েছে, শিল্প-সংস্কৃতি চর্চার একদিন তা কেন্দ্রভূমি ছিল। তা আজ দৃশ্যত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও তার প্রভাব সেই অঞ্চলের সকল জাতির লোকের মধ্যে এখনো প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। সেইজন্য সেখানকার জনজীবনের মধ্যে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে আমরা তার ভিতর থেকে বাঙালীর জাতীয় সংস্কৃতির বহু উপাদান এখনো উদ্ধার করতে পারি। .....উত্তরবঙ্গের লোক-সংস্কৃতির উপাদানগুলো যে প্রায় অকৃত্রিম ভাবে সংরক্ষিত আছে, তার প্রধান কারণ গৌড়ের পতনের পর থেকেই পাঁচশত বৎসরেরও ঊর্দ্ধকাল যাবৎ তার বিচ্ছিন্নতা এবং সেগুলো এতো শক্তিশালী তার কারণ একটা বিধ্বস্ত সাম্রাজ্যের মধ্যমতী সাম্রাজ্য বলে, তার শিল্প-সংস্কৃতিগত ঐতিহ্য। অনেক সময় নাগরিক শিল্প-সংস্কৃতি যখন নানা কারণে বিধ্বস্ত হয়ে যায়, তখন তার উপকরণগুলো জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে লোক-সংস্কৃতির রূপলাভ করে। একদিন গৌড়ের সাম্রাজ্যকে কেন্দ্র করে যে সংস্কৃতি এই অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল তা নানাভাবে জনসাধারণের ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে বিচিত্রমুখী লোক-সাহিত্যের রূপলাভ করেছে। একটা শক্তিশালী ঐতিহ্যের উপর তার প্রতিষ্ঠা বলে তাকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে সেখানে আর কোন নূতন সংস্কৃতি জন্মলাভ করতে পারেনি।"(১)

ইংরেজ রাজত্বকালে উত্তরবঙ্গ ভারতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হলেও এই অঞ্চলের রাজনৈতিক পরিমন্ডল ছিল সামন্ততান্ত্রিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও ইংরেজ ধনতন্ত্রের অধীন। ফলে এই অঞ্চলের জনগণ প্রাচীন বিচ্ছিন্নতায় আপ্লুত থেকে অশিক্ষা, অবিদ্যা, কুসংস্কার ও প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারনার বশবর্তী হয়েছিল। আর্থ-সামাজিক অবহেলা ও শোষণকে তারা ভাগ্য বলেই মেনে নিয়েছিল। এরূপ রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশে লোক-সংস্কৃতিই ছিল লোক-জীবনের পুষ্পিত বিকাশ। তাই লোকনাটক উত্তরবঙ্গের লোক-সমাজকে আনন্দধারায় সিঞ্চিত করে সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষা প্রদানের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছিল। এইজন্যই লোকনাটক উত্তরবঙ্গের জন-জীবনে স্থায়ী আসন করে নিয়েছিল।

উত্তরবঙ্গের লোক-জীবনের বিচিত্র কাহিনী এখানকার লোকনাটকে সোনালী সূতোয় বোনা যেন এক একটি নক্সী-কাঁথা। জলপাইগুড়ি জেলার চা-বাগান অঞ্চল বাদ দিয়ে বাকী উত্তরবঙ্গের জনজীবন এখনও বেশী পরিমানেই কৃষিনির্ভর লোকায়ত ও গ্রামীণ। তবু দেখা যায় প্রত্যেক জেলার সমাজ-জীবন একধরণের নয়, জেলাভেদে এর বৈচিত্র্য দেখা যায়। প্রত্যেক জেলার লোকনাটকে সেই জেলার সমাজ জীবনের নানা দিক যেমন, চাষবাস, সমস্যা, দিনযাপন-স্বপ্ন ও বাস্তব, আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে।

মালদহ জেলা ঃ

মালদহ জেলার সমাজ-জীবন হল কৃষি-নির্ভর। এই কৃষিকেন্দ্রিক সমাজে অজ্ঞতা, অশিক্ষা এসে অক্টোপাসের মত আকঁড়ে ধরেছিল। দুঃখ, দারিদ্র্য কৃষিজীবি মানুষের নিত্যসহচর। তাদের মধ্যে থেকেই উঠে এসেছে লোক-শিল্পী যারা লোক-কলার আশ্রয়ে লোক-মনকে আনন্দ দেয় এবং তারই ফাঁকে জনশিক্ষা ও লোক-সাংবাদিকতা করে। তাদের শিল্পে খুঁজে পাওয়া যায় সমাজ জীবনের সত্য-অসত্য সম্পর্কে শিক্ষা ও কর্তব্যবুদ্ধির উপদেশ। এই লোকশিল্পের একটি অঙ্গ লোকনাটক। এটি নৃত্য-গীত-সংলাপে মুখরিত হয়ে, গ্রামীণ লোকায়ত সমাজের অজ্ঞ, নিরক্ষর, স্বল্প শিক্ষিত মানুষকে যেমন আনন্দ দেয় তেমনি দেয় দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয়।

গম্ভীরা গানঃ গম্ভীরা গান কৃষি নির্ভর লোকজীবনের অঙ্গ। শিব হলেন কৃষির দেবতা। তাঁকে উপলক্ষ্য করে সামাজিক অন্যায়, অত্যাচারের কাহিনী তুলে ধরা হয় এবং তাঁর কাছেই অভিযোগ জানানো হয়।

চলমান ও পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থায় গম্ভীরাশিল্পী সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপস্থাপনের বিষয়বস্তুকেও পরিবর্তন করে নেন। তাই আজকের গম্ভীরা গানে আজকের সমাজ-জীবনেরই প্রতিফলন পাওয়া যাবে।

ইংরেজ শাসনের আগে মুসলমান শাসন কালে গম্ভীরা শিল্পী গাইতেন—

"আশমানের চান (চাঁদ) চাহিয়্যাছে।
পাওঁর তলত জমিন নাই,
পরহ্নেতে ত্যানা নাই,
পিরহান নাই, দানা নাই
বিবি, বেখবর হইয়্যাছে।।"

(আশমানের - আকাশের । পাওঁর - পায়ের । পরহ্নেতে - পরনে। ত্যানা - ন্যাকড়া, ছেঁড়া কাপড় । পিরহান - গায়ের জামা। দানা - খাবার)

এই অংশটিতে লোকজীবনের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। বিবি চেয়েছে আকাশের চাঁদ, এদিকে জমি, গায়ের কাপড়, জামা, খাবার নেই। দারিদ্র্য পীড়িত সমাজের প্রতিভূ হয়ে উঠেছিল এই গম্ভীরা গানের পদটি।

প্রাক্-স্বাধীনতা কালে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জানিয়ে পদ রচিত হয় —

" শিব হে। স্বরাজ পেলে মন্ডা দেবো
ঘন দুধের বাটি দেবো
নইলে কাচাকলা, ও ভোলা, ও ভোলা।"

এই পদটিতে বলা হয়েছে স্বাধীনতা পেলে শিবকে মন্ডা, ঘনদুধের বাটি দেওয়া হবে। এ থেকে বোঝা যায় দরিদ্র মানুষের জীবনে মন্ডা ও ঘন দুধের বাটির আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, কিন্তু তাদের আর্থিক অবস্থা এমনই যে এ সব তাদের কাছে পূজোর প্রসাদের মতো।

আর একটি গম্ভীরার বন্দনা গানে দেখা যায় —

" স্বরাজ যদি পাই ভোলা,
খ্যাতে দিব মানিক কলা (মর্তমান কলা), নইলে
অ্যাঁঠ্যার (বিচি) কলা।
বানিয়া হল দেশপতি
কি বলব ভাই দেশের গতি
কাঁচ দিয়ে কাঞ্চনাদি নেয়
হাতে দিয়ে খোলা।"

(মনোরঞ্জন দাস রচিত)

এই গানে ইংরেজকে বলা হচ্ছে বণিক, তারা দেশের মালিক হয়েছে, তারা কাঁচ দিয়ে সোনা নিয়ে যায়। এথেকে পরাধীন দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার আঁচ পাওয়া যায়।

আর একটি বন্দনা গানে অভিযোগের সঙ্গে প্রতিকারের আবেদন জানানো হচ্ছে—

" ভোলা হে ! একি কর‍্যাছ দেশের দশা,
ভাঙ ধুতুরা খ্যায়া শুধু ব্যোম হয়্যা আছ বোস্যা।
প্যাটেতে আজ ভাত নাই, পরনেতে ত্যানা,
হাল-বলদ সব বেচ্যা ফেল্যা, দিতে হলি খাজনা।
এখন কি করি হে, ভোলা নানা, তার উ পর রোগের জ্বালা
হারিয়্যা ফেল্যাছি দিশা।"

এগানে শিবের কাজে দুঃখী গাঁয়ের মানুষের আর্তি — আজ তারা দিশাহারা, পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই, তার উ পর রোগের জ্বালা। এসব দুঃখের কারণ শিব, তাই তার কাছে অভিযোগ।

আবার আর একটি গানে দেখা যায় শিব নিজেও দুর্দশাগ্রস্থ —

" শিব তোমার একি সাজ মাথায় বাঁইধ্যাছ কেলে জটা
ম্যালেরিয়ায় ভুইগ্যা ভুইগ্যা ভুঁড়ী কইর‍্যাছ মোটা।"

শিবের এরূপ অবস্থা যেন সমাজের সাধারণ মানুষেরই অবস্থা।

এই শিবকেই আবার অভিযুক্ত করে—

" এই বুড়াটা দিলে বড় দুরুখ হে, দিলে বড় দুরুখ।
ধান বুনিলে দ্যায়না পাণি, এই বুড়াটা বড়ই শনি
সদাই রহে মোদের প্যাটে ভুক হে।"

অভাবে, অনাহারে, দুঃখে দারিদ্র্যে কাতর জনমানসে গম্ভীরা গান হয়ে ওঠে তাদের জীবনের প্রতিফলন।

আর্থিক জীবনের অবস্থা যেমন গম্ভীরা গানে প্রতিফলিত হয়েছে তেমনি সিপাহী বিদ্রোহের, সাঁওতাল বিদ্রোহের কথাও ঠাঁই পেয়েছে। যেমন—

"বুঝি ফিরিঙ্গি দল এবার ভাইরে ধোর‍্যা নিলে খাঁটা,
সিপাহী সব মিল্যা অদের করলে বলির পাঁঠা।
গরু আর শুয়ারের চর্বি দিয়া কারতুজে যেরে টোটা।
হিন্দু আর মোসলেমের বুকে মাইর‍্যা দিল খাঁটা।
জাতি ধর্ম নেই এক ফোঁটা।

....

ব্যারাক পুর আর রানীগঞ্জে গেল আগুনলাইগ্যা।

....

সিপাহীর দল থাকলো সব রাইগ্যা
গোটাভারত উঠল জাইগ্যা।।"

ডুয়েট বা দ্বৈত সঙ্গীতগুলোতে সামাজিক অন্যায় অবিচারের এবং শোষণের নানা চিত্র ফুটে ওঠে যেগুলো সমাজের প্রতিটি সাধারণ মানুষের অন্তরের আকূতি। পণ প্রথার জন্য দরিদ্র পিতা কন্যার বিয়ে দিতে পারছেনা, তার মনের দুঃখ প্রকাশ পেয়েছে গানের এই অংশটিতে—

" ভন্ড দেশের হিতৈষী, ওরাই রক্ত চোষে
বি-এ, এল-এ হলে ছেলে অর্থপিয়াসী
ধিক্ উচ্চশিক্ষা, স্বদেশী শিক্ষা
প্রীতি কেবল টাকা'র মোহে।"

কৌলিন্য প্রথার জন্যে সমাজে যে শোষণ দেখা দিয়েছে তার করুণ অবস্থা পিতার গানে প্রকাশ পেয়েছে—

" কি কুক্ষণে আদি সুর, আনলে দেশে অসুর,
বল্লালের চোখে নুন দিয়ে মারতে কেন কল্লে কসুর,
মেয়ের বাপ দুম্বা-মেষ, এ পোড়া বাংলাদেশ
নিতি খাচ্ছে মাংস কেটে নিয়ে দিচ্ছে ক্লেশ।"

ইংরেজ সরকারের অত্যাচারের কথাও গম্ভীরাগানে সমভাবেই স্থান পেয়েছে, আর স্থান পেয়েছে চা-বাগানের শ্রমিক-পীড়ণের চিত্র।

"কোনই দোষ করিনি মোরা, অন্যায় অত্যাচার
ও করিনি কাউরো প্রাণ সংহার।
বন্দীভাবে জালিয়ান বাগে।
আমরা আগুন দেইনি তোপ কামানে।
সাহেব গুতা মারিনি চায়ের বাগানে।"

গম্ভীরা শিল্পী মহম্মদ সুফীরএকটি গানে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের প্রকাশ ঘটেছে—

"ইংরেজ সরকার অকারণে
মারল প্রাণ
ঘেরে জালিয়ানা বাগে
গা তোল উঠেছে সব জেগে।"

জালিয়ানওয়ালাবাগে সাধারণ নিরপরাধ মানুষদের চারদিক বন্ধ করে হত্যা করা হয়েছিল। ইংরেজ রাজত্বে ভারতবাসী শোষিত হত, তার প্রতিফলন রয়েছে এখানে —

"ওরা পেয়ে মোদের হাতে
মারল কাপড় ভাতে
ফেইল্যা দিয়া মুলুক শুদ্ধা টান।"

সাধারণ মানুষের দুঃখ, দারিদ্র্য, হতাশা, শোষণ, দেশীয় সমস্যা, স্বাধীনতার প্রসঙ্গ যেমন গম্ভীরা গানের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছেছে তেমনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্যও গম্ভীরাগানের শিল্পীরা গান বেঁধে মানুষকে সচেতন করেছেন—

"ওহে শিব নিরঞ্জন, কুন ফ্যাসাদে ফেললা তুমি হায়।
এযে মিলন দড়ি ছিড়্যা দিয়া তাজিয়াতে কাজিয়া লাগায়।
এযে হিন্দু-মুসলমান ছিল এক আসনে থান।
গলাগলি পিরীত করতো, গাইতো গম্ভীরা গান।
(এখন) দেখ্‌ছি ঢাক ভাঙ্গা আর তাজিয়া টানা
ডাঙাতে ডিঙা ডুবায়।
....
শুন্যাছি যবন হরিদাস ছিল চৈতন গোঁসার দাস
হরি আল্লা একই ভাব্যা নস্যাৎ করলে বাস।
....
চাঁদ সুরুজ তোমার এক নদী,বাতাস,আগুন এক
দুনিয়ার মানুষ দ্যাখছে শুনছে খাচেনিছে
ঐ এক জনারই সিজ্জন করা সারা দুনিয়ায় একজনাই।
শিব মিটাও গন্ডগোল লাগাও আজান, ঢাক আর ঢোল
আল্লা আল্লা হরি হর ধর সবাই বোল।"

বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি দীর্ঘকালের। তবুও মাঝে মাঝে রাজনৈতিক ফায়দা লুটেরাদের চক্রান্তে সম্প্রীতির স্থির সরোবর উদ্বেল হয়ে ওঠে। সাধারণ মানুষ হয় বিভ্রান্ত। এই বিভ্রান্তি দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে উপরের উল্লিখিত গানটিতে।

ঝড়বৃষ্টি বন্যায় গণজীবন কতটা বিপর্যস্ত হয়েছিল তার প্রাতিফলন ঘটেছে নিচের গানটিতে—

"এবার কি খাবা, হে বাবা পুয়াল চাবাও বোস্যা।
কোন মুলুকের বন্যা এলো মোর বাবা হে —

দোর বান্দি হে।
কোন্ দোখ্না বাতাস আইস্যা হে, পুয়াল, চাবাও বোস্যা
আমের গাছের ডালটা খাড় ভাদই ধানের আশা ছাড়
ভাতিয়ার বিল হাতিয়ায় নিলে মোর বাবা হে—
দোর বান্দি হে।"

ঝড় বৃষ্টি বন্যায় মানুষের দুর্গতির শেষ নেই। তাই গম্ভীরা শিল্পী শিবকে দুঃখে বলেছেন পোয়াল অর্থাৎ খড় চিবোতে।

কিছু কিছু গম্ভীরা গান থেকে জানা যায়, মালদহের কুটির শিল্প রেশমের অবনতির জন্য মানুষের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কথা। এই সঙ্গে চালের দাম ক্রমাগত বাড়ছে। এই অবস্থায় জনজীবন দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছে।

" শিব হে, কি করিব হে এবার বাঁচবে না আর প্রাণ
টাকা স্যারের চাউল হয়্যা লাইগ্যা গেল টান
বাঁচবে না আর প্রাণ।"

কৃষিজীবি মানুষের বেঁচে থাকার সমস্যা দেখা দিয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগে। অনাবৃষ্টিতে মাঠে ফসল ফলল না, গরুছাগল জলকষ্টে মরতে লাগল। এমন দুর্যোগের কথাও গম্ভীরা গানে প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন—

" কৃষকেরা ভাবছে বোস্যা উ পায় কিবা করিহে
ধান কলাই হলনা ভাই, হলনা জল ঝড়ি হে
জল বিনা সব ম'ইল গরুবকরী একিহল বিষম জ্বালা
ক্যামনে বাঁচবে ছেইলা পিলা .....'

গান্ধীজীর অস্পৃশ্যতা বর্জন, সুরাপান বর্জন নিয়েও গম্ভীরা শিল্পীরা গান বেঁধেছেন।গম্ভীরা গানের রচয়িতারা রোমান্টিক কবি নন, ধর্মীয় সংগীত রচয়িতা বাউল, আউল, সুফী, মারফতী বা মরমীয়া কবিও নন, তাঁরা মাটির পৃথিবীতে চোখ খুলে চলেন, তাই তাদের রচনায় ফুটে ওঠে সাধারণ মানুষের হৃদয়ের কথা, সমস্যাজর্জর সমাজের শতছিন্নরূপের কথা, লজ্জাহীন শোষণের কথা।

গম্ভীরায় একটি বিশেষ অংশ থাকে, সেটি হল রিপোর্ট বা খবর। শিববন্দনা, ডুয়েট,চারইয়ারী ইত্যাদির মধ্যে যেমন সমাজজীবনের বিভিন্ন দিক ফুটে ওঠে তেমনি রিপোর্ট বা খবর অংশে অঞ্চলের বা জেলার বিভিন্ন খবর পরিবেশিত হয়।

লোকজীবনের অধিকাংশ সময়ই কাটে নিরক্ষরতা, অজ্ঞানতা, বুভুক্ষা, দৈন্য ও হতাশায়। সেখানে সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমগুলো পৌঁছতে পারে না, পৌঁছলেও তা কাজে আসে না। কিন্তু নাচ-গান-বাদ্যের দ্বারা কৌতুক-ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ সহযোগে যে লোকনাটক পরিবেশিত হয় তা থেকে সেই সকল অজ্ঞ, নিরক্ষর, স্বল্পশিক্ষিত লোকায়ত মানুষ সহজেই শিক্ষা লাভ করে এবং নাটকে বর্ণিত ঘটনাকে অনুধাবন করে। সংযোগ মাধ্যমের একমাত্র কাজ নয় কেবল সংবাদ পরিবেশন করা, সংবাদের মূল্যায়ণ করাও তার দায়িত্ব। লোকনাটকগুলো সে দায়িত্ব পালন করে থাকে। ইদানীন্তনকালের রাজনৈতিক প্রচারে গণসংযোগের একটি গুরত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে " 'পোষ্টার ড্রামা' এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে; বাংলার লোকনাট্যের..... এই ধরনের পোষ্টার ড্রামার কোন চারিত্রিক হেরফের নেই" (২)

লোক-নাট্যের দর্শক-শ্রোতা অতি সাধারণ মানুষ তাই তাদের কাছে আজকের শহুরে গণমাধ্যমগুলোর অভিক্ষেপণ অত্যন্ত ক্ষীণ। রেডিও, টিভির প্রভাব বাড়লেও লোকায়ত মানুষের হৃদয়ে পৌঁছতে পারে না। এর কারণ ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত উল্লেখ করেছেন, " But communication is a complex problem, as it involves cultural communion between different parts of the people.You may easily cross the distance in space, but not so easily the difference of tastes and education, patterns of mind and thought."(৩) লোকনাট্যের উপস্থাপনার মধ্যে যে সহজ, অনাড়ম্বরতা রয়েছে—তার কারণেই চট্ করে তার অভিভাবনার সঙ্গে দর্শকের মানের সংযোগ-সঞ্চারণ ঘটতে পারে। জাঁক-জমক নেই বলেই তা গ্রামীণ মানুষের কাছে স্বচ্ছন্দ, স্বাভাবিক।" (৪) গম্ভীরা গানের রিপোর্ট বা সালতামামিতে দেখা যায় সংবাদ পরিবেশন —

১. খোলস ছাড়া এক এম.পি.
পাঁকা চুলে পরে বিয়ের টুপি
থাকলে সোলেমান সুফি
ফেলতো তাকে নাকালে।
২. ভার প্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার

বি. জে. পির প্রচারে ব্যস্ত এবার
স্বার্থ সিদ্ধি হবেনা তার
পানি পাবে না হালে।

৩. সরকারী ইলেকট্রিক সাপ্লাই
গুনের তাদের অন্ত নাই
জ্যোৎস্না রাতে আলো জ্বালায়
আঁধারে নিভায়।

আমাদের দেশের মানুষের কাছে উন্নত গণমাধ্যমগুলোর চেয়ে লোকায়ত গণমাধ্যমগুলো বেশী কার্যকরী। তাই গম্ভীরা গানের শিল্পীরা যে স্তরেরই হোক, তারা লোকায়ত জীবনকে উপলব্ধি করে এবং লোকায়ত মানসকে সঞ্জিবীত করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর গম্ভীরা গানের বিষয়বস্তুতে রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটে। এর ফলে গম্ভীরা গানের সার্বজনীনতা ও আবেদন ব্যাপক হয়। গম্ভীরা শিল্পীদের মধ্যে মোহাম্মাদ সুফী রহমানের মত অনেক মুসলমান শিল্পী গম্ভীরার বিষয়বস্তুকে শিববন্দনা ও কৃষিব্যবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলেন না। যে রাজনৈতিক পরিবেশ ও প্রতিবেশ জনজীবনকে প্রভাবিত করেছে তার প্রকাশ ঘটালেন। সমাজ জীবনের ক্ষয়-ক্ষতি,সুবিধা-অসুবিধা, সমস্যার হাজার জগদ্দল পাথর যে চেপে বসেছে তার কথা জানালেন।

আলকাপ গানঃ সামাজিক বিষয়বস্তু নিয়ে আলকাপ লোকনাট্য মালদহের জনজীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। "এটি কেবল মাত্র মুসলমান সমাজেই প্রচলিত, যদিও হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ই গম্ভীরার মত এর রস গ্রহণ করে। হিন্দু গায়কও এতে আছে।" (৫)

আলকাপের ফার্স বা চাচোর অংশে "লাব্বার ও ছোক্‌রার মধ্যে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক রেখে পারিবারিক আলাপ-আলোচনা, মান-অভিমান, দুঃখকষ্ট, সুখশান্তি , প্রীতি-ভালবাসা, সৃষ্টি-সমস্যা, গ্রাম বা দেশের কোন বিশেষ ঘটনার সমালোচনা তাৎক্ষণিক কথোপকথন ও গানের মাধ্যমে পরিবেশন করা হয়। নিজেদের মধ্যে বহু আলাপ আলোচনা, তর্কবিতর্কের পর গ্রামের মোড়লকে ডাকা হয় সমাধানের জন্য। মোড়লবেশী খলিফা এসে সমস্যার সমাধান করেন।" (৬) গ্রামবাংলার সমাজব্যবস্থার মর্মস্পর্শী চিত্র ফুটে ওঠে আলকাপের মধ্যে। গম্ভীরায় শিব যে স্থান দখল করেছে আলকাপে মোড়ল সেই স্থানে স্থাপিত হয়েছে। আলকাপের বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব বেশী দূর এগোয়নি।

"আলকাপ হল মস্করা। আলকাপের শ্রোতা চিরদুঃখী, দরিদ্র কৃষক, শ্রমিক সম্প্রদায়। স্বচ্ছলতা এদের জীবনে স্বপ্ন। দুঃখেই এদের জন্ম, দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন কাটিয়ে একদিন দুঃখের মধ্যে এদের জীবনের অবসান ঘটে "। (৭)

সমাজজীবনে নরনারীর প্রেমের স্বাভাবিক গতি ও বক্রগতির প্রকাশ আলকাপগানে ফুটে ওঠে। যেমন—

১) নয়নে নয়ন মিলায়ে রেখেছি
ধরে নিয়েছো আমার মন।
আসবোনা বলে গিয়েছ চলে
কতনা রহিলাম তোমার পথ চেয়ে
শয়নে স্বপনে বাহুর বন্ধনে
মিলায়ে রেখে ছিলাম অতি যতনে।।

২. বন্ধু আমার বাড়ী এলে
প্রেমের বাক্স দিবো খুলে।

মামা-ভাগ্নিতে বিয়ের সম্বন্ধ করায় কন্যার দুঃখ প্রকাশ পায় এভাবে—

"আগে যদি জানতাম আমি
মামার সাথে বিয়ে
আঁতুর ঘরে মরতাম আমি
গলায় দড়ি দিয়ে।"

বিরহ-বিধুর মনের আকুতি প্রকাশ হয় এই গানে—

"চৈতা বৈশাখা পিয়া গরমকা দিন
রাতিয়ামে খাটিয়াসে নাহি আবাই নিন।।"

প্রেমকে সার্থক করে তুলতে না পারলে প্রেম করা বারণ। তাই আলকাপে গাওয়া হয়—

" মন না দিতে যদি পার হে
প্রেম করিতে তুমি এসো না।"

আলকাপে ভোলার বন্দনাও হয়। এই বন্দনায় ভোলা যেন গ্রামীণ মানুষেরই একজন। তাই তারও সমালোচনা করতে ছাড়ে না। সে সমালোচিত হয় সকলের সামনে।

মানব মনের স্বাভাবিক আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ছড়া কাটা হয়। এই ছড়াগুলোতে প্রকাশ হয় ব্যক্তিমানসের নানা দিক। মানুষ যা সামনে দেখে তা পাবার জন্য কামনা করে, আবার সামর্থ্য অনুযায়ী সেই কামনা তার কোন কালেই চরিতার্থ হয় না। গ্রামীণ জীবনের কৃষি ভিত্তিক সমাজের মানুষের আশাগুলোও খুব সামান্য। কিন্তু মানুষের মনের শাশ্বত আকাঙ্ক্ষা কতগুলো থেকে যায়, সেগুলো যেকোন সমাজের মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। তেমন কথাই বলা হয়েছে নিচের ছড়াটিতে—

" চোর যেমন ইচ্ছা করে সদায় অন্ধকার
রমনী যেমন ইচ্ছা করে বাড়ুক অলংকার
বুড়ী যেমন ইচ্ছা করে হইতে যুবতী
রাখাল যেমন ইচ্ছা করে হইতে নৃপতি।"

আলকাপের দ্বৈতসঙ্গীতগুলোতেও দেখা যায় অতি সাধারণ মানুষের প্রণয়ের নানা দিক। নারী পুরষের সাংসারিক জীবনযাত্রার চিত্রই এতে বেশী প্রকাশিত। পালাগানগুলোতেও সমাজের বিভিন্ন মানুষের মধ্যে যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিদ্যমান সেগুলো চিত্রিত হয়েছে।

এই সকল আলোচনার পর বলা যায় আলকাপ গ্রামীণ কৃষিজীবি মানুষের আনন্দলাভের উপায়, যার মধ্যে গ্রামীণ কৃষিজীবি মানুষ নিজেদের জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়। হাস্যকৌতুকের মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে সরস করে তোলা হয়, কিন্তু বিষয়বস্তুর কোন অভিনবত্ব নেই। আধুনিক জনজীবনের সমস্যা ও বর্তমান রাজনীতি থেকে আলকাপ এখনও বহু দুরেথাকায় এর আবেদন ব্যাপক হয়ে উঠেনি। ফলে আলকাপ লোক-সাংবাদিকতার মাধ্যম হয়ে উঠতে পারেনি গম্ভীরা গানের মত। বর্তমানে আলকাপের জনপ্রিয়তা কমে যাচ্ছে, এর স্থান দখল করছে নতুন আঙ্গিকে " পঞ্চরসের গান"।

ডোমনীগান : মালদহের দিয়ারা অঞ্চলের লোক-সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের একটি বিশিষ্ট আঙ্গিক 'ডোমনীগান'। দিয়াড়া অঞ্চলের কথ্যভাষা 'খোট্টা' তে এই গান রচিত ও পরিবেশিত হয়। এই দিয়ারা অঞ্চল গঙ্গা-বিধৌত পলি-মৃত্তিকাময় ও ঘন বসতিপূর্ণ। এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একটি মিশ্ররূপ দেখা যায়। ভাষাগত দুর্বোধ্যতার জন্য এই পালাগান দিয়ারা এলাকার বাইরে প্রসারিত হয়নি।

ডোমনীগানের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এর অসাম্প্রদায়িক চরিত্র। এর বন্দনা অংশে হিন্দু দেবদেবীর সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম পীর পয়গম্বরদের শ্রদ্ধা জানানো হয়। যেমন—

" সৈদপুরের কালীমাঈ আর
পড়ুয়েকা পীর"(পড়ুয়েকা-পান্ডুয়ার)

পান্ডুয়ার পীরদরগার উরুস উপলক্ষে মালদহের বিভিন্ন প্রান্তের হিন্দু মুসলমান আসেন মানত করতে বা মানত শোধ করতে। সৈয়দপুর হল মানিকচক থানার একটি গ্রাম। এখানকার কালীমাতা জাগ্রত দেবীরূপে পূজিতা হন। পয়লা বৈশাখ এই কালীপূজো হয়। এই পূজো উপলক্ষ্যে মেলা হয় এবং মেলার আকর্ষণ ডোমনীগান।

কৃষিজীবি মানুষের আনন্দের একটি অবলম্বন ছিল ডোমনীগান। এই গানের মধ্য দিয়ে আদিরসই বেশী পরিবেশিত হত। যেমন—

"আতাকে গাছমে খোতা লাগালিয়ো
ঠোপ ঠোপকে পানি চুলালিয়ো, গে ডোমনীয়া।।"
(আতা গাছে খোঁচা দিলাম
টপ্ টপ্ করে জল চুইয়ে নিলাম, ওগো ডোমনারী।।)

এই গানটিতে আতা দিয়ে নারীবক্ষ বোঝানো হয়েছে।

অপর একটি গানে দেখা যায়—

"হায় হায় খ্যাড়ে রহো ফুলবাগমে
লওবঙ্গিয়া ঝলক্যাই না।

অ্যাইসি পত্‌ল্‌ ক্যমর (পাতল কোমর)
কাঁহা পাইলে না।"

(লওবঙ্গিয়া > নোরঙ্গী > নারেঙ্গী = কমলালেবু)

এই গানের লওবঙ্গিয়া পদটি দিয়ে নারীর স্তনকে বোঝানো হয়েছে।

ডোমনীগানে আদিরসাত্মক গানের খোলামেলা প্রকাশ থেকে বলা যায় সামাজিক জীবন অতি সহজ সরল এবং শিক্ষার প্রসার অত্যন্ত কম। অশিক্ষিত, নিরক্ষর মানুষ যদি জীবনযাত্রার জটিলতার মধ্যে না পড়ে তবে সারল্য থেকে যায়। এই সরলতাই প্রকাশ করেছে আদিমতাকে। মালদহের বিবর্তমান সমাজব্যবস্থায় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর আচার আচরণ, ধ্যানধারনা, ভাষা ইত্যাদিবহু পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তন ডোমনী গানের মধ্যে খুব সামান্যই পরিলক্ষিত হয়।

গ্রাম্য কুৎসা, অতিলৌকিক বা অলৌকিক কাহিনী বা বিষয়বস্তু ডোমনীগানের অবলম্বন হওয়ায় সামাজিক অবস্থানকে আদিম কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলা যায়। তবে বর্তমান কালে গম্ভীরা ও আলকাপের প্রভাবে ডোমনীগানেও প্রতিবছর নতুন নতুন বিষয় নিয়ে গান গাওয়ার চেষ্টা চলছে। অর্থাৎ দিয়ারা অঞ্চলের সমাজজীবনে একটি পরিবর্তনের স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে।

ডোমনী গানের ছড়া ও গানের মধ্য দিয়ে জনশিক্ষা ও লোক-সাংবাদিকতা পরিলক্ষিত হয়। গ্রামীণ সংবাদ তাৎক্ষণিক ভাবে রচিত গানের দ্বারা বা সংলাপে উপস্থাপিত করা হয়। এই উপস্থাপনা স্থানীয় ভাষায় হয় বলে দর্শক শ্রোতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে। সামাজিক অন্যায়, অবিচারের শোষণ ও বঞ্চনাকে কেন্দ্র করে রচিত ছোট ছোট পালাগুলো তীব্র বিদ্রুপের কশাঘাত ও হাস্যকৌতুকের অনাবিল প্রকাশ ঘটে এই ডোমনী গানে। পরিশেষে বলা যায়, ডোমনী গানের বিষয়বস্তু সামাজিক হলেও তার শিল্পীদের মর্ত্য প্রীতি ও মানব প্রীতি অপরূপ সুরব্যঞ্জনায় বিধৃত হয়ে পরিবেশিত হয়।

সংগৃহীত ডোমনী পালাটিতে (শিরুয়ামেলার গান) সমাজের বিভিন্ন দিক ফুটে উঠেছে। দারিদ্র্য পীড়িত হয়েও শিরুয়া মেলায় যাওয়া চাই-ই। মহাজনেরা আপন স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টায় সাধারণ মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বাঁধানোর চেষ্টা করে। খেপিয়ে তোলা হয় হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়কে, একটিকে অপরটির বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া হয়। জনসাধারণ নিরক্ষর বলেএই সব ষড়যন্ত্রের কথা বুঝতে পারে না। তাই তাদের সাক্ষর করে তুলবার চেষ্টা করা হচ্ছে। কারণ সাক্ষরতাই হল এই সবকিছুর সমাধান। শিক্ষা মানুষকে দেয় চেতনা।

বোলবাহি ঃ মালদহের বোলবাহি গান বর্তমানে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এর মধ্যে ছিল তখনকার সমাজের নানা প্রতিচ্ছবি। বোলবাহি আদিরসাত্মক হলেও অবৈধ প্রণয় এবং তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, নানা কেচ্ছা এতে থাকত। একান্তই ব্যাক্তিগত পালা হওয়ায়ও সমাজের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করত। তাই এর প্রতি মানুষের আকর্ষণ ধীরে ধীরে কমে যায়।

ভাজোই গানের পালা ঃ লোকসংস্কৃতির বাক্‌নির্ভর ও পারফর্মিং শাখায় নারীর সৃষ্টিমূলকতার উল্লেখ্য নিদর্শন হিসাবে ভাজোইগানের পালার গুরত্ব অপরিসীম। গৃহস্থবাড়ীর ভেতরে গোপনে এই গান অনুষ্ঠিত হয়। মেয়েদের সাংসারিক জীবনের বাইরেও মনের গোপন ইচ্ছার কিছু কিছু প্রকাশ ঘটে পালার গানগুলোতে।

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ঃ
(প্রাক্তন পশ্চিম দিনাজপুর জেলা)

উত্তর ও দক্ষিন দিনাজপুর জেলার লোকনাটকগুলো এই জেলা দুটোর প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থাতেই উদ্ভুত হয়েছে। এই জেলাদ্বয়ের রাজবংশী-দেশী-পলি সমাজের অর্থনৈতিক উপায় হল কৃষি। কৃষিজীবি মানুষের মানস গড়ে উঠেছিল জৈন-বৌদ্ধ-হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য-বৈষ্ণব-ইসলাম ধর্মের স্রোতধারায় ভেসে ভেসে অথবা অবগাহন করে। কৃষিকেন্দ্রিক সমাজে শষ্য রোপন ও শষ্য কর্তনকে কেন্দ্র করে নানা স্তবস্তুতি, নানা উৎসব মেলার আয়োজন হয়ে থাকে। প্রাচীন লোকজীবন ও সমাজের পূজা বা অনুষ্ঠানের শুরুতে ছিল নৃত্যগীত এবং স্ত্রীপুরুষের মিলন ও আমোদ উৎসব। প্রকৃতির নানা ঋতুকে সামনে রেখে বিভিন্ন জাতির কৌম আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কার গড়ে ওঠে। সেখানে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ হয় না। তাই সেই সমাজের প্রচলিত ধারণা সমাজটিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখে। মহাভারতের যুগেও যেমন দেখা গেছে স্ত্রী-পুরুষের মিলন না ঘটলে প্রকৃতি উর্বরা হয় না: যেমন ঋষ্যশৃঙ্গমুনির কাহিনী, আসামের বিহু উৎসব (রঙালী বিহু), ত্রিপুরার বৈছাগু, আরও অনেক উপজাতীয় উৎসব কৃষির উর্বরতাকে লক্ষ্য করে করা হয়। পশ্চিম দিনাজপুর জেলার লোক-নাটকের স্রষ্টা হল এখানকার প্রচীন জাতি-

উপজাতি অর্থাৎ দেশী, পলি, রাজবংশী সমাজ। "এদের গোষ্ঠীগত ঐতিহ্য মঙ্গোলয়েড মানবধারা সম্পৃক্ত।.......... দের গোষ্ঠীগত চেতনায় এবং নারী- প্রধান সমাজ কাঠামোয় সংস্কৃতির কতগুলি আচরণীয় বিধি বর্তমান যা এখনও কর্নিকার মত অবিনশ্বর। লোকাচার মৃত্যুঞ্জয়ী।" (৮) তাই বলা যায় লোকনাটকের মৌলিকতায় লোকাচার ও লোকবিশ্বাস আজও স্বভাব-সক্রিয়।

এই জেলাদ্বয়ের লোকনাটকগুলো কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় সৃষ্টি হয়েছে। কৃষিজীবি, মৃত্তিকালগ্ন সমাজের মানুষের জীবনসংগ্রামের নানা চিত্র এই নাটকগুলোতে প্রতিভাত হয়েছে।

ঢাকোসরি পালাটিতে স্বাধীনচেতা নারীর চরিত্র মনসরি। মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অবলুপ্তির বহু শতাব্দী পরে নারী স্বাধীন চেতনা সমাজে মূল্য পাচ্ছিল। তাই এই পালায় দেখা যায় মনসরি স্বামীর ঘর করতে চায়না। কারণ স্বামী ও সমাজ তার কাছে কঠোর, বিমুখ। মৈমনসিংহ গীতিকায় 'মহুয়া' বা 'মলুয়া' চরিত্রে স্বাধীন প্রেম-চিন্তা লক্ষ্য করা যায়। এধরণের চরিত্র হল মনসরি। সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থা নরনারীর ব্যক্তি-সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রিত করে এবং প্রয়োজনে সমাজ সম্পর্কে আঘাত হানে। ঢাকোসরি পালাটিতে এইসব প্রতিভাত হয়েছে।

"ভারতীয় লোকসমাজে উৎপাদন ভিত্তিক ধনগত বৈষম্য যেমন আছে, লোক সমাজের তৃণমূলে তেমনি রয়েছে মানুষের সচেতন সাঙ্গীক প্রীতি ও মৈত্রীর সম্পর্ক। বৃত্তির বৃত্তে এটা ভারতীয় গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের মূল সুর।" (৯) ভালমন্দ লোক নিয়ে সমাজ। সেখানে তৃণমূলস্তরে চলে সম্পর্কের ভাঙাগড়া। গড়ে ওঠে সম্প্রীতি এবং তা লোকচক্ষুর সামনে সমুদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এধরনের প্রতিচ্ছবি প্রতিভাত হয়েছে বন্ধু পূছা বা বন্ধু আলা লোকনাটকে।

ঘরজামাইর কথা ফুটে উঠেছে 'সুমিতা যোগীর গান' পালাটিতে। এই ঘরজামাই থাকার রীতি মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অবশেষ এবং পরবর্তীকালের পিতৃতান্ত্রিক সমাজের দাস প্রথার প্রকাশ। শ্বশুর বাড়ীতে শ্রমদান, বাস করা ইত্যাদি আধুনিক কৃষিজীবি সমাজে দুর্লভ নয়। 'শিকইমালা' পুরুষের কণ্ঠে পরানোর অর্থহল প্রতীকি বন্ধন। এই রীতি এই জেলা দুটোর পলি সমাজে প্রচলিত ছিল।

লোকসমাজে স্ত্রীকে বন্ধক দেবার রীতি প্রচলিত ছিল, তারই প্রকাশ ঘটেছে 'মায়্যাবন্ধকী'তে। এই বন্ধক দারিদ্র্যের জন্য হতে পারে, আবার সামাজিক ব্যাভিচারের জন্যও হতে পারে। দরিদ্র হিন্দু আদিবাসী সমাজে বা মুসলমান কন্যা বিক্রীর রীতি প্রচলিত ছিল। দাস প্রথা যেমন প্রচলিত ছিল, তেমনি বিপরীত ক্রমে দাসী প্রথারও প্রচলন ছিল। মধ্যযুগীয় দাস প্রথার রেশ বর্তমানেও নিম্নবর্গীয় লোক সমাজে বা বন্ধক দেবার রূপে প্রচলিত রয়েছে। সমাজের উচ্চবর্গের মানুষের শঠতা, লাম্পট্য, ছলনা, প্রতারণা, প্রেম, বাসনা, চুরি, গুরুগিরি, শোষণগুলোর প্রায় সবই এই পালাটিতে স্থান পেয়েছে। সামাজিক অপরাধের বিচার শেষ পর্যন্ত 'গণআদালতে' বা দশজনের বিচার-ব্যবস্থার সম্মুখীন হয়। সেখানেই তার চরম শাস্তিবিধান করা হয়। গ্রামীণ সমাজে পঞ্চায়েত ব্যাবস্থার গভীর প্রভাব যেন এই গণ-আদালতে প্রকটিত হয়।

খন (শাস্তোরী) আজকাল অভিনীত হতে দেখা যায় না। বৈষ্ণব-গোসাই-গুরুবাদ কেন্দ্রিক পালা হল বোষ্টম-বাউদিয়ার গান বা নয়ানসরি। এই পালাটি বৈষ্ণবীয় তন্ত্রসাধনার লৌকিক ব্যাখ্যায় পূর্ণ। "বাউল, সহজিয়া, বৌদ্ধ, তন্ত্র, সুফিবাদ ও মরমিয়া সাধনা উত্তরবঙ্গের লৌকিক জীবনেতরল হয়ে জীবন স্রোতে মিশে গেছে।" (১০) যুগের পর যুগ নানা ধর্মীয় ও লোক-বিশ্বাস নির্ভর মতবাদ জনজীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এই পালাটি দেশীপলি সমাজে প্রচলিত বৈষ্ণব গোঁসাইবাদের প্রত্যক্ষ উদাহরণ। বৈষ্ণব বাউদিয়া সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করেন। কিন্তু বৈষ্ণব গোসাই তার শিষ্যকন্যা নয়ানসরির বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

নয়ানসরির মতই বৈষ্ণবতত্ত্বের রসভাষ্য ফুটে উঠেছে বর্মসরি বা ব্রহ্মশ্বরী পালায়। ব্রহ্মশ্বরী পিতামাতার অনুমতি নিয়ে গোঁসাইর সেবাদাসী হয়ে রামকেলির পথে যাত্রা করে। এথেকে অনুমান করা যায় যে পরকীয়া প্রেম সাধনার ধারা ষোড়শ শতকের পর বরিন্দ ভূমিতে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল। কৃষিভিত্তিক সমাজজীবনে ভাববাদ এত দ্রুত প্রভাব ফেলে যা থেকে দরিদ্র ভাগ্য হত মানুষ কখনই মুক্ত হতে পারেনা। শাস্তোরি খনের পালাগুলো যেন তারই ইঙ্গিত বহন করছে।

কৃষক-জীবনের সরলচিত্র ফুটে উঠেছে এই জেলা দুটোর ব-খেলা 'হালুয়া-হালুয়ানী'। চৈত্রমাসের গ্রামবাংলার ছবি যেমন, প্রখর রৌদ্রতাপ, শুক্‌নো কুয়ো, খাদ্যাভাবগ্রস্ত চাষীকে শ্রম করতে হয়। কৃষকের সমাজের বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সাধ-আহ্লাদ, দাম্পত্যজীবনের সুখ দুঃখ, বিকেলে বীজ ছিটানোর নিখুঁত চিত্র হাস্যরস, গীতি-নৃত্য-সহযোগে অভিনীত হয়। এই পালাটি লোকসমাজের আচার-কৃত্য(Ritual)। এই লোক-সমাজ হল দেশী-পলি-রাজবংশী সমাজ। কৃষিকে কেন্দ্র করে যে সব লোক-বিশ্বাস ও লোকাচার প্রচলিত তারই ইঙ্গিত বহন করেছে এই ব-খেলাটি। স্ত্রীর কান্না থামাতে চাষী ওঝার কাছ থেকে জল পড়া অর্থাৎ মন্ত্রপূত জল আনে। এতে কান্না থামে। ওঝার ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস মধ্যযুগীয় লোকজীবনকে আবিষ্ট করে রেখে ছিল বলে ধরা যায়। চাষী অসুস্থ হলে হালুয়ানী তার সেবাযত্ন করে। তখন হালুয়ানী তার দুঃখের কথা তার দিদিকে বলে—

"মোর মনটা কান্দেছে গো বাই
জোহিলা পড়া টাক দেখিয়া
গরম জলের নোটাটো মিছরির ডিকাটো
লইয়া কতয় করিম মুই উঠাসলা
আধা রাতিয়া।"

স্বামীর সেবা করে হালুয়ানীর অর্দ্ধেক রাত পার হয়। তার যৌবন থাকে অপূর্ণ। নারীর এই দুর্ভাগ্যকে দুর করে তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করার অবস্থা এখনও উত্তরবঙ্গের দেশী, পলি, রাজবংশী সমাজে আসেনি। পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত সমাজে নারীর ভাগ্য এভাবেই লেখা হয়। হালুয়া যখন বুঝতে পারে হালুয়ানী বিরক্ত হয়ে পড়ে তাকে সেবা করতে করতে। তখন সে একটু সুস্থ হতেই তাকে নিয়ে দাদুর বাড়িতে চলে যায়। দাদু তাদের বিয়ে দিয়েছিল। তাই চাষী স্ত্রীকে দাদুর হাতে সঁপে দিয়ে যায়। এভাবেই বিরহ ভারাক্রান্ত হয়ে নারীর জীবন-যৌবন অতিক্রান্ত হয়। এই বিরহ দেখা যায় কোচবিহারের ভাওয়াইয়া গানে। সেখানেও নারীর তৃষ্ণার্ত যৌবন ব্যর্থ হয়ে যায়।

আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় সাক্ষরতার বিস্তারের প্রচেষ্টা বিশ্বজুড়ে চলছে। তারই সাথে সঙ্গতি রেখে খনগানের সাক্ষরতা পালা রচিত হয়েছে। মানবসমাজের অংশীদার হয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার প্রেরণা এই পালাটিতে রয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে দুঃখ দারিদ্র্য যতই থাকুক না কেন শিক্ষা যেকোন মানুষের অতি প্রয়োজনীয়: কারণ শিক্ষা আনে চেতনা: চেতনা মানুষকে শক্তিমান করে তোলে। বিশ্বসমাজের সঙ্গে সহজভাবে মিশে যাবার প্রকাশ ঘটেছে এই পালাটিতে।

সন্তান বড় হলে তাদের বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা পিতামাতার কর্তব্য। গ্রামের মানুষ এই কর্তব্য ভোলে না। কিন্তু গ্রামের অর্থনীতি নির্ভর করে ফসল উপাদনের উপর। ফসল ভাল না হলে দুটো পয়সা হাতে আসে না, তাই মনের সাধ মেটানো যায় না। তাই মেয়ের মা যখন মেয়ের বিয়ে দেবার কথা মেয়ের বাবাকে বলে তখন মেয়ের বাবা ফসল উৎপাদনের কথাই বলে। ঐ বছর উৎপাদন ভাল না হওয়ায় বারতি কাজ করা সম্ভব নয়। তাই মেয়ের বিয়ে এখন দিতে পারবে না। প্রেমের উদ্দামতা প্রেমিক-প্রেমিকাকে মিলনাকাঙ্ক্ষী করে তোলে। সামাজিক বাধা, অভিভাবকের আর্থিক অস্বচ্ছলতাকে উপেক্ষা করে স্বাধীনভাবে পরস্পর মিলিত হবার জন্য আইনের আশ্রয় নিতে যায়। আইনের প্রতি আনুগত্য, দেবতার প্রতি বিশ্বাস হাগড়ু ভদ্রীর ছিল। এইসব ঘটনা নিয়ে রচিত হয়েছে 'হাগড়ু-ভাদ্রীর পালা'। গ্রামীণ মানুষের আর্থ-সামাজিক স্বরূপ এই পালায় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

জলপাইগুড়ি জেলা ঃ

গ্রামীণ সমাজ-জীবনের সত্যমূলক কাহিনী মূখ্যতঃ প্রেমকাহিনী গানের বাঁধনে বেঁধে লোকনাটকের অঙ্গনে লোক-শিল্পীরা পরিবেশন করে লোক-মানসে আনন্দ বিতরণ করেন। খাসপাঁচালের কাহিনীতে সামাজিক প্রেমই ঠাঁই পায়। কিন্তু সমাজে বিচিত্র মানুষের সমাবেশ, তাদের মহত্ব, দীনতা, নীচতা, উদরতা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সামাজিক পরিবেশকে পরিচালিত করে। সম্পত্তির অধিকারী যুবতী বিধবার প্রতি সমাজের একশ্রেণীর মানুষের স্বার্থলোলুপ দৃষ্টি চিন্তাসরির কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। গ্রমীণ সমাজে পুরোহিত বা ফকিরের যথেষ্ট প্রভাব ছিল এবং এখনও অনেক জায়গায় আছে। চিন্তাসরি পালায় ফকিরের অবির্ভাব ঘটেছে, ফকিরের মন সাধারণত উদার ও মহৎ হয়, কিন্তু গ্রামের স্বার্থলোলুপ মানুষগুলোর সঙ্গে তারও মন স্বার্থপর হয়ে উঠেছে। ভুত গ্রামীণ জীবনে যুক্তিহীন ভয় সৃষ্টি করে। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, কোচবিহার জেলায় প্রাচীন রাজবংশী সমাজে 'দেও' কথাটি প্রচলিত। 'দেও' হল 'দেবতা' কিন্তু এখানে উপদেবতা বা অপদেবতা রূপে ব্যবহৃত হয়। ভূত গ্রামীন সমাজের মানুষগুলোকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। চিন্তাসরি পালার পরিণতিতে দেখা যায়, চিন্তাকে পাবার জন্য যারা চেষ্টা করল, তারা কেউই তাকে পেলনা। চিন্তাকে নিয়ে গেল অপরে। না পাওয়ার জন্য ভাগ্যের দোহাই দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। কৃষিজীবি সমাজব্যবস্থায় মানুষের মন হয় ভাববাদী এবং ভাববাদীরাই ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল হয়।

সমাজের মাতব্বর যারা তাদের শঠতা ও স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টায় সাধারণ মানুষ কিভাবে বিভ্রান্ত হয় তারই নাট্যরূপ 'মেনকাশ্বরী পালা'। সামাজিক জীবনের নিবিড় নাট্য প্রয়াস হল খাসপাঁচালের বিভিন্ন নাটক।

গ্রামীণ জীবনে সাধারণ প্রেমের কাহিনী যেন রবীন্দ্রনাথের কথা মতো হয় — "প্রেমের ফাঁদ পাতা আছে ভুবনে, কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে।" রঙপাঁচালের কাহিনীগুলোই প্রেমকাহিনী। সামাজিক জীবনে নর-নারীর প্রেম কি বিচিত্র গতিতে প্রবাহিত হয়। পরস্ত্রীর সঙ্গে প্রেম ও তার পরিণতি 'সংসারগোপী' পালাটির উপজীব্য বিষয়। কলিকালের স্বামীরা বাউন্ডুলে, স্ত্রীদেরও স্বামী পছন্দ হয়না; জাত বিচার না করে বিবাহিত হয়েও পরপুরুষের সঙ্গে প্রেম করে। এধরণের প্রেমে সামাজিক অশান্তির সৃষ্টি হয়। তাই আনন্দের মধ্য দিয়ে শিক্ষা প্রদানের জন্য রঙপাঁচাল লোকনাটক অভিনীত হয়।

লোকনাটকের শিল্পীদের বেশিরভাগই কৃষক। তাদের জীবনযাপনের বিভিন্ন দিক নিয়ে রচিত হয়েছে 'হালুয়া-হালুয়ানী'। অতি সাধারণ একচাষীর জীবনে সহজ কামনা চরিতার্থ করবার আকাঙ্ক্ষা, তা রূপায়িত না হওয়ায় মানসিক চাপ সৃষ্টির জন্যে মান-অভিমান যা একান্ত ই সাধারণ— এই লোকনাটকের কাহিনীতে বিধৃত। সাম্প্রদায়িকতা সমাজে ছিলনা, ধর্ম নিরপেক্ষতা সমাজে প্রচলিত ছিল তা 'হালুয়া-হালুয়ানী' পালা থেকে বোঝা যায়।

চৌর্য বৃত্তি নিয়ে অসংখ্য মিথ ও ট্যাবো(Taboo) প্রচলিত রয়েছে। সেই মিথ বা ট্যাবোকে ভিত্তি করেই 'চোর-চুরণী পালা' প্রচলিত ছিল। বর্তমানে চোর-চুরণীর পেছনে কোন মিথ বা ট্যাবো আছে বলে বিশ্বাস করেনা। চোর-চুরণীর দুঃখময় জীবন কাহিনী এই পালাতে রূপ পেয়েছে।

জোতদার জমিদারেরা ভেস্টল্যান্ডকে বেনামে, হাতির নামে, বেড়ালের নামে করে রেখে নিজেরাই ভোগ দখল করে, তারই কাহিনী রয়েছে মান-পাঁচালের 'ভেস্তেশ্বরী' পালায়। জনগণ জমির ক্ষুধায় কাতর, তাই তারা সেইসব ভেস্টল্যান্ড উদ্ধারের জন্য প্রচেষ্টা চালায়। এই জমি উদ্ধারের জন্য জনগণ বুকের রক্ত দিতেও পিছপা হয়না।এই চিত্রটি ৫০-৬০ এর দশকের। তাই বর্গা-অপারেশনের পর ভেস্ট ল্যান্ডের কাহিনী ইতিহাস হয়ে গেছে।

প্রাচীন সংস্কার এবং ধর্মবিশ্বাস সমাজে দৃঢ় মূল হয়েছিল। মানুষ সেইসব সংস্কার কোনরকমেই পাল্টাতেচায়না। দেবতার স্থান উঁচুতে, তাই উঁচু ঢিবিতে দেবতাই বাস করেন, এই বিশ্বাস সাধারণ মানুষের মনে দৃঢ় মূল হয়েছিল। দেবতার কাছে প্রার্থনা জানালে ফল লাভ হয়— এবিশ্বাসও মানুষের মনে সুদৃঢ় হয়ে রয়েছে। এইসব বিশ্বাস নিয়েই 'ফাঁকতাল' লোকনাটক রচিত হয়েছে।

স্বামীর বাড়ীতে স্ত্রীর সুখ হয়না আর্থিক অভাবের জন্য এই দুর্গতি নিয়েই 'কবিশ্বরী' পালা।

গ্রামীণ জীবনে অলস কর্মবিমুখতা দেখা যায়। কোন যুবক অলস কর্মবিমুখ, তার বুড়ী বিধবা মার দুঃখ। এই কথাই তুলে ধরা হয়েছে আজলজলা পালায়।

দার্জিলিং জেলা :

বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারের ফলে তরাই অঞ্চলে রাজবংশী সমাজে বৈষ্ণবীয় ভাবাদর্শ গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এই ধর্মীয় আবেশ নিয়ে এখানকার লোকনাটক তৈরী হয়েছে। 'কুঞ্জলীলা' বা 'কুঞ্জবন' পালায় রাধার ভূমিকা প্রাধান্য পেয়েছে। সমাজের যে স্তরে নারীরা বাস করে সেখানে হতাশা, বিরহ, তাদেরকে কুড়ে কুড়ে খায়। সেজন্য কুঞ্জলীলা পালা এই অঞ্চলে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা কাহিনী লোকমানসকে রঞ্জিত করেছে এবং ধর্মীয় ভাবনায় আপ্লুত করেছে। কৃষিজীবি মানুষের দুঃখময় জীবনে এই ভাববাদী চিন্তা অবলম্বন হিসেবে কাজ করে। সামাজিক জীবনে প্রেমের রূপ এই পালাতে প্রতিফলিত হয়েছে।

কৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার পর তাকে মথুরায় চলে যেতে হয়। তখন কৃষ্ণ অদর্শনে রাধার মন শূন্যতায় ভরে ওঠে। কৃষ্ণ বিরহে অধীরা রাধার ভাবের প্রকাশ ঘটেছে 'বিরোগ' বা 'বিরক' পালায়। এ যেন 'মৈষালবন্ধু' বা আসামের গোয়ালপাড়া জেলার (বর্তমানে ধুবরী জেলার) 'মাহুত বন্ধু' পালার নায়িকার মনের বিরহবেদনার প্রতীকী রূপ।কাহিনীযেখান থেকেই নেওয়া হোক না কেন পালকার বা গীদালের বাস্তব দৃষ্টি কখনই সমাজ বহির্ভূত হয় না। সমাজের লোক-মানস সার্থকভাবে বিরোগ বা বিরক পালায় ফুটে উঠেছে। বতেয়া পালাগুলোতেও সামাজিক ছোঁয়া থাকে।

প্রেম এবং প্রেমের পরিণতি বিবাহ। এই সহজ ধারণার উপরই মানব সমাজের বহমানতা বজায় রয়েছে। অতিসাধারণ প্রেম-কাহিনী চন্দ্র দেবীর গান তরাই অঞ্চলের লোক-জীবনের সাহজিক প্রকাশ। তবে বিয়ের আগে প্রেম বহু সমাজে স্বীকৃত হয়নি। কিন্তু চন্দ্র দেবীর গানে এর স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। তাই বলা যায় এই পালাটি সমাজের প্রগতির কথাই তুলে ধরেছে।

কোচবিহার জেলা :

কোচবিহারের প্রাচীন লোক-মানস সাক্ষরবিহীন,দরিদ্র্য, কৃষিজীবি, ধর্মীয়সংস্কারাচ্ছন্ন, রাজভক্ত থাকায় তাদের লোক-কলায়ও সেই মানসিকতাই ফুটে ওঠে। কিন্তু সংগৃহীত লোকনাটকগুলোতে সমসাময়িক সমাজের প্রভাব বেশী পরিমানে

দেখা যায়। কারণ, লোকনাটকের কোন লিখিত রূপ নাথাকায় পাহাড়ী নদীর মত মূল বা গীদালের মুখে মুখে নাটকের বিবর্তন চলতে থাকে। পরিবর্তমান নাটকে প্রচীনতা ধরে রাখা সম্ভব হয় না। তবুও এদের ঐতিহ্যবাহিতা লক্ষ্যনীয়।

প্রথমেই কুশান পালা গুলোতে যে সমাজ প্রতিফলিত হয়েছে তার আলোচনা করা যাক। "আর্যেতর সংস্কার যেমন লৌকিক দেবদেবীর সৃষ্টি করেছিল তেমনি প্রত্যন্ত পল্লীতে আর্য-সংস্কৃতির ব্যাপক প্রভাব না পড়ায় সেই লৌকিক দেবদেবীর আরাধনা ব্যাপক রূপ লাভ করেছিল। যদিও শিবের কন্যা হিসাবে মনসাকে দেখানো হয় তবু শিবভক্ত মনসা পূজা করতে দ্বিধা করেন। আর্যেতর সংস্কার বাঙালীর মনকে আপ্লুত করে রাখায় মনসামঙ্গলের বহুল প্রচার মধ্যযুগে হয়।" (১১) সেই মনসামঙ্গলের লোকায়ত রূপ 'বিষহরি' পালায় ফুটে ওঠে। কোচবিহারের সাধারণ মানুষের লৌকিক মানস এই পালার জনপ্রিয়তায় পরিলক্ষিতহয়। উত্তরবঙ্গের সব জেলাতে শিবের আধিপত্য রয়েছে। তার মধ্যেও দেখা যায় 'বিষহরি' পালা লোক-মানসকে রঞ্জিত করেছে। বিয়ের আগে 'বিষহরি' গানের আয়োজন ধর্মীয় সংস্কারের বশেই হতো কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলাতে। লখিন্দরের বাসরঘরে সর্পদংশন লোকমনে ভয়ের সৃষ্টি করে, সেই ভয় থেকেই ভক্তি এবং বিয়ের আগে 'বিষহরি'র অনুষ্ঠান করার ব্যবস্থা করা হত। রাজবংশী সমাজে এই ব্যবস্থা ধর্মীয় সংস্কারে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু তাই বলে তা ছিল সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে।

কোচবিহারের লৌকিক-সমাজে পান গুয়া(কাঁচা সুপারি) অতিথি অভ্যর্থনার সময় প্রদানের রীতি। তাই 'সতী বেহুলা' পালায় দেখা যায় চাঁদ সদাগর যখন বেহুলাকে দেখতে যান তাঁর ছেলের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করতে তখন লেংয়ার মুখ দিয়ে বলানো হয়: " ভালে কথা, একেনা গুয়া পান আনেক,হক্কাটা আনেক।" ঠেংয়ার গানের মধ্যেও কোচবিহারের খাদ্যাভ্যাসের বর্ণনা রয়েছে —

" ডিমার তরকারী রান্দিছে ঢোলমানকন দিয়া।
অম্বল রান্দিয়া থুইছে শুকাতি মিশাইয়া।।
খেসারীর ডাইলৎ দিছে শুকটার ফোরান।
পায়েস রান্দিছে দিয়া করকচ লবণ।।
সরবতে মিশিয়া দিছে সিদলের রস।
বিয়াই খাইয়া কত করিবে সুযশ।।
ট্যাংয়া দৈ-এ কটকটা চুড়া।
আটিয়া কলার বিচি খাবে চাঁদ বুড়া।।"

এই গানটির অর্থ হল, ডিমের তরকারী রেঁধেছে মানকচু দিয়ে, টক রেঁধেছে শুক্তো মিশিয়ে, খেসারী ডালে দিয়েছে শুক্‌নো মাছের ফোরণ। পায়েস রেঁধেছে করকচ লবণ দিয়ে। সরবত মিশিয়েছে ক্ষার জাতীয় জিনিস (কলা গাছের খোল শুকিয়ে, তা পুড়িয়ে, সেদ্ধ করে রস তৈরী করা হয় তাকে সিদল বলে)।এসব বেহাই মশাই খেয়ে সুখ্যাতি করবে। টক দৈতে শুক্‌নো চিড়ে আর বিচিকলা খাবে চাঁদবুড়ো।

কোচবিহারের প্রাচীন জনসমাজে শুক্‌নো মাছ, সিদলের রস, টক দৈ, শুকনো চিড়ে, বিচিকলা অত্যন্ত জনপ্রিয় খাদ্য।

কিছু সংস্কার লৌকিক মানসে দানা বেঁধে থাকে। তারমধ্যে যেমন ভয় পেলে কনিষ্ঠা আঙুলে কামড় লাগায়। গোদানী মৃতদেহ দেখে ভয় পেয়ে বলে—'কানি নগুলটা কামড়ে দেং। আঁচলের একনা তাও দেবু।' ভুত প্রেতের ভয়ে গোদানী পূজো দেবার কথা বলেছে। জীবনে কোন বিপদ হলে লৌকিক মানুষ দেবতা বা উপদেবতার পূজো দিতো তাকে খুশী করার জন্যে। আর্যেতর সংস্কৃতির ধারায় এধরণের পূজোর প্রচলন আছে।

বানেশ্বরের শিবমন্দির কোচবিহারের লোকমনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাই বেহুলাকে গোদানী পরামর্শ দেয়: " এলা বাবাতো শিবপুরত থাকে না। বাণাসুর উয়াক বানেশ্বরত বসাইচে। আইঢালী কুরাও দিঘী আছে। ঐ দিঘী থাকি বংতি নদী বিরাইচে। ঐ নদীত গাও ধুইয়া বাবারাটে বর চাবু। যা চাবু তায় পাবু। ঐদেখ বংতি নদী।"

বানেশ্বরের শিব ও বংতি নদী এবং বাণাসুরের প্রতিষ্ঠিত করার কাহিনী কোচবিহারে বহুল প্রচলিত। তাই মনসামঙ্গলের লৌকিক রূপায়ণে আঞ্চলিক ভূগোল স্থান পায়।

লোকনাটকের কাহিনীর ফাঁকেফাঁকে যেমন ফাঁস গান বা খোসা গান পরিবেশিত হয় তেমনি সামাজিক সমস্যার কথাও স্থান পায়। যেমন, বেহুলা লোহার কলাই জলের মত সিদ্ধ করে দিয়ে তার সতীত্ব প্রমাণ করে। তাই দেখে চাঁদের অনুচর লেংফা বলে "এই কইনাই ভাল। হামার অত্তি কন্ট্রোলের চাউল বোল্ডারের মত। উয়ায় রান্ধিলে চিন্তা নাই।" দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের কন্ট্রোলের অব্যবস্থার প্রসঙ্গ এখানে এসেছে। এই ভাবে 'বিষহরি' পালায় লোক-সাংবাদিকতাও হয়ে থাকে।

রামায়ণ ও মহাভারতের প্রভাব ভারতের সর্বত্রই রয়েছে। কোচবিহারের লৌকিক জীবনও সেই প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। তাই কুশান পালার পৌরাণিক কাহিনীগুলো রামায়ণ মহাভারত থেকেই নেয়া। রাম-কহিনী আলোচনা করলে মঙ্গল হয়— এই ধারণা দরিদ্র, নিরক্ষর লোক-জীবনের বিশ্বাস ছিল। কুশান পালার উদ্ভব হয়েছে অনেক পরে অর্থাৎ দোত্‌রা পালা ও বিষহরি পালার পরে। সেজন্য দেখা যায়, কুশান গানের ভাষা পরিশীলিত।

লক্ষ্মণের শক্তিশেল পালায় রামের সঙ্গে রাবণের যুদ্ধ যেন অশুভ শক্তির সঙ্গে শুভ শক্তির যুদ্ধ। সমাজে ন্যায়, সত্য, সামাজিক শৃঙ্খলা ও শুভশক্তিকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য রামায়ণের কাহিনী যথেষ্ঠ প্রভাবশালী। রাম,লক্ষ্মণ,ভরতের ভ্রাতৃপ্রেম, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিভীষণের প্রতিবাদ, লক্ষ্মণের প্রভুভক্তি সামন্ত তান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রয়োজনীয় উপাদান। রাজন্য-শাসিত কোচবিহারের লোক মানস সারল্য, নম্রতা ও রাজানুগত্যে পরিপূর্ণ। তার উপর ধর্মীয় সংস্কার কুশান গানকে জনপ্রিয় করেছে।

লোকনাটক তাৎক্ষণিক ভাবে মুখে মুখে রচিত হয় বলে মূল,দোয়ারী ও অভিনেতাদের প্রতিভার উপর নির্ভর করে নাটকের উৎকর্ষ। দোয়ারী সমসাময়িক ঘটনার উপর অভিনয় করে আবার দেহতত্ত্বের নানা বিষয় নিয়েও সংলাপ বলে বা গান করে। দোয়ারীর এরূপ অভিনয় কখনই মনে হয়না নাটক বহির্ভূত। সে সমসাময়িক লোক- জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ- ক্ষোভ,নানা সামাজিক সংবাদ-সমালোচনা পরিবেশন করে শ্রোতা বা দর্শকের অতি নিকটের হয়ে যায়। সমাজের অতি সাধারণ মানুষের মনের আকৃতির প্রকাশ ঘটায় দোয়ারী।

দানের মহত্ব ও সমাজে দাস প্রথার কথা নিয়ে রচিত 'দানবীর হরিশ্চন্দ্র পালা'। কোচবিহারে দাস প্রথা নামে প্রথা না থাকলেও অভাবের তাড়নায় সন্তান বিক্রয় হত, সেকথা অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে। দানবীর হরিশ্চন্দ্র পালাটি অত্যন্ত জন প্রিয়। কোচবিহারের দরিদ্র, সাক্ষরবিহীন লৌকিক মানসে যখন অর্থনৈতিক দুরবস্থা ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল ভাবে তখন এই পালাটি জনপ্রিয় না হয়ে পারে না। মহাভারতের কাহিনী নিয়ে পালাটি অভিনীত হলেও এতে এখানকার সাধারণ মানুষের প্রতিচ্ছবি যেন তুলে ধরা হয়।

দোত্‌রা পালার বেশীরভাগ কাহিনীই কল্পনা ও বাস্তবের সংমিশ্রণ বলা যায় (fantacy)। তবুও এরই মধ্যে সমাজ জীবনের নানা চিত্র ফুটে ওঠে।

দোত্‌রা পালার প্রতি কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে নরনারীর প্রেম যা সামাজিক মানুষের সহজ চাওয়া-পাওয়া। তবুও এরই মধ্যে রাজন্যশাসিত সমাজে রাজকর্মচারীর মনের অবস্থা প্রকাশ হয় 'বিশ্বকেতু-চন্দ্রাবলী' পালায়। যেমন—

" ভাজা ঃ রাজার চাকরী বিষম দায়।
কোনদিন পেটে অন্ন ধরে;
কোনদিন বা এমনে যায়।।
তাজা ঃ আরে তোর অন্ন আর অন্ন। বন্দুকের গুলী
খাইলে অন্ন আর না লাগে— তাও আবার
একলা নোয়ায়—গুষ্টি চৌদ্দপুরুষ পর্যন্ত সারা।"

লোক মনে নানা কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস ছিল, সমাজে অপদেবতার ভয় ও যুক্তিহীন বিস্ময় ছিল। বনের মধ্যে মূর্চ্ছিত বিশ্বকেতুকে দেখে তাজা বলে— তাকে পেত্নিতে ধরেছে।

"বানিজ্যে বসতি লক্ষ্মী" কথাটি বিভিন্ন পালার মধ্যে ফুটে উঠেছে। প্রাচীন বাঙালীরা বিদেশে বানিজ্য করতেন এবং ধনী হতেন। ধনীদের প্রভাব সমাজে অসীম। তাই দুবুলাবালী পালায় চন্দ্রপতি ধনী আর দুবুলা দরিদ্র: ধনীদের খেয়াল চরিতার্থ করাই যেন দরিদ্রদের কাজ।

অপরের চাকরীতে স্বাধীনতা কোনদিনই থাকে না। তাই শ্যামকালা সময়মত তার প্রেয়সীর কাছে আসতে না পেরে আত্মঘাতী হয়েছিল (দুবুলাবালী পালা)। নারীর সতীত্ব রক্ষার আদর্শ যেমন লোকসমক্ষে তুলে ধরা হয় তেমনি ফাঁকে ফাঁকে চলে গণশিক্ষার ব্যাপার। যেমন, বিশ্বকেতু -চন্দ্রাবলী পালায় রয়েছে—

" রাক্ষস মেসাম্বর: পৃথিবীর অধিক গুরু হয় কোন জন?
গগন হইতে উচ্চ কোন মহাজন?
তৃণের অধিক ক্ষুদ্র কোন মহাশয়?
পবনের অগ্রেতে কে চলে যায়?

বিশ্বকেতু : পৃথিবীর অধিক গুরু হয়েন জননী,
গগন হইতে উচ্চ পিতা বলে মানি,
তৃণের অধিক ক্ষুদ্র ভিক্ষুক যে জন
পবন অগ্রতে চলে আপনার মন।"

মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যেমন উদারতা, মহত্ত্ব, নীচতা, হিংসা, প্রেম, স্নেহ ইত্যাদি কল্পনা-মিশ্রিত কাহিনী অবলম্বন করেও প্রকাশিত হতে কোন বাধা পায়নি। দোত্‌রা পালাগুলো সাম্প্রতিকত্বের প্রভাব মুক্ত। পরবর্তীকালে সমাজ জীবনে নানা ধর্মের প্রভাব পরলেও দোত্‌রা পালার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন থেকে যায়।

সমাজ জীবনে কোন ধর্মীয় বিভেদ সৃষ্টি হয়নি এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় ছিল মুসলমান আক্রমনের পর। তাই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে গুঞ্জরাবিবি, করিম বাদশা পালাগুলো জনপ্রিয়। হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি কোচবিহারের দরিদ্র মানুষের মধ্যে বিরাজ করছিল।

প্রতিটি লোক-নাটক একটি সামাজিক দর্পণ। সাধারণ জীবন দারিদ্র্য ও অনিশ্চতায় দাঁড়িয়ে থাকে তারই একটি চিত্র তুলে ধরেছেন ডঃ দিগ্বিজয় দে সরকার তাঁর "কোচবিহারের লোক-নাটক" গ্রন্থে:

"— ওহে সূর্যঠাকুর তোমরা ক্যানে এমন?
— ক্যানে?
—২৪ ঘন্টার মাঝত্ তোমরা মাত্র ১২ ঘন্টা ডিউটি দেন বাহে। বাকি ১২ ঘন্টা কোন্টে যান?
— কি হইল তোমার?
— মোর ভাঙ্গা ঘরত চোর সোন্দায়। আর............................।
— আর কি ?
— ঝড়ি - বিষ্টির দিনত কোন্টে থাকেন তোমরা?
— ক্যানে?
— মোর ভাঙা চালা। কানি তেনা ভিজি যায়— শুকায় না।
মোর ছাওয়া ছোট, কোন্টে যাবে হে।" (১২)

কোচবিহারের লোক-নাটকগুলো বয়েসে প্রবীণ। অন্য জেলার লোক-নাটকের মত হালে সৃষ্টি করা কোন ঘটনা এখানকার নাটকে নেই। দোত্‌রা পালায় প্রেম বিশ্বজয়ী, কুশানেও নারীর প্রেম-সতীত্বই বড়কথা। প্রত্যেকটি লোকনাট্যই লৌকিক সমাজের স্বচ্ছ দর্পণ।

তথ্যসূত্র :

১) ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য— উত্তরবাংলার গ্রামীণ লোকনাট্য (প্রবন্ধ);
লোক-সংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা (বিশেষ সংখ্যা, ৮মবর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৯৯৬)।

২) পল্লব সেনগুপ্ত — বাংলার লোক-নাট্য, তার দর্শক সমাজ ও গণ সংযোগ মাধ্যম। (প্রবন্ধ)। (লোকশ্রতি/ডিসেম্বর, ১৯৮৬)

৩) Dr. Kshetra Gupta — Folklore and much Communication.(লোক - সংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা/বৈশাখ - আষাঢ়, ১৩৯৫)

৪) পল্লব সেনগুপ্ত — বাংলার লোকনাট্য, তার দর্শক সমাজ ও গণ সংযোগ মাধ্যম (প্রবন্ধ)। লোকশ্রুতি/ডিসেম্বর, ১৯৮৬)

৫) ডঃ প্রদ্যোত ঘোষ— লোক সংস্কৃতি: গম্ভীরা।পৃ:-৮৬

৬) ডঃ ফনী পাল — আলকাপ। পৃ:-২৩

৭) প্রগুক্ত। পৃ:-৫১।

৮) দুলাল চৌধুরী—পশ্চিম দিনাজপুরের লোকনাট্য: একটি সমীক্ষা। (মধুপর্ণী/ পশ্চিম দিনাজপুর জেলা সংখ্যা,১৩৯৯)

৯) প্রগুক্ত।

১০) প্রগুক্ত।

১১) শ্রী অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়— বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত (২য়সং) ১৩৭৫। পৃ-৬৫

১২) ডঃ দিগ্বিজয় দে সরকার— কোচবিহারের লোকনাটক। পৃ:-১৪